স্মৃতির পাখিরা ঃ সুধীন্দ্রনাথ পর্যায়

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে আমি আবিষ্কার করেছিহাম ১৯৫০ -এর সেপ্টেম্বর মাসে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা বইখানিতে। দাদা সেটা প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরি থেকে পুজোর ছুটিতে জলপাইগুড়ি নিয়ে এসে ছিলেন আমাকে দেখাবার জন্য। তাতে সুধীন্দ্রনাথের অনেক গুলি কবিতা ছিল। ছন্দ, ধবনি, শব্দ নির্বাচন, শব্দে নিহিত ধ্যান, বাক্যব্যঞ্জনা, বিষয়বস্তু, আত্মসংবিতের রসমূর্তি এই সমস্ত মিলে পুরো বইটির মধ্যে সুধীন্দ্রনাথই আমাকে বেশি আকর্ষন করেছিলেন। জীবনানন্দের চেয়েও, প্রেমেন্দ্রর চে য়েও। পুজোর ছুটিরপরে আনন্দচন্দ্র কলেজ লাইব্রেরির বন্যবিধবস্ত একগাদা বইয়ের ভেতর থেকে জীবনানন্দের সন্ধান পেয়ে যখন তার অরণ্যে পাহাড়ে সাগরে বন্দরে প্রান্তরে যথেষ্ট বিচরণ করি তখনই প্রথম ওই কবির গভীর মহত্ত্বে অভিভূত হই।কিন্তু আগে এক মাসের জন্য সুধীন্দ্রনাথই ছিলেন আমার ভেতরকার অসন্তোষ, আন্দোলন, বিভ্রান্তি, বিবশতা, যন্ত্রণাও হতাশার অব্যর্থ কাব্যিক অভিব্যক্তি - আমার একান্ত ব্যক্তিগত কবি।

কেন সুধীন্দ্রনাথ মাত্র সাত- আটটি কবিতা দিয়ে আমার দিনরাত্রিকে সম্পূর্ণভাবে একমাসের জন্য গ্রাস করেছিলেন এখন মাঝে মাঝে তা বোঝার চেষ্টা করি। একদিকে বাবা- কাকা প্রমুখ গুরুজনদের উপেক্ষায় তচ্ছিল্যে তিরস্কারে, কালো হাফপ্যান্ট পরে মুসলিম বস্তিতে আমার জীবন কাটবে শুনে শুনে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছেছি অন্যদিকে আমাদের বাসার পেছনে মুসলিম বস্তি থেকে বাল্যের খেলার সাথীরা নিজ নিজ আববা- আম্মার সঙ্গে এতদিন পরে নিজদের মুলুকের হদিস পেয়ে চলে যাচ্ছে আমাকে সাথীহারা করে আর তাদের ছেড়ে যওয়া জায়গা দখল করে নিচ্ছে যেসব নতুন আগত তারা যেন ছিল কোনও জ্বলন্ত গ্রহের বাসিন্দা, প্রচন্ড বিক্ষোভে এখনও জ্বলছে- পরিবেশের এই বিপুল পরিবর্তনে উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে আমি তখন মরিয়াভাবে বোঝার চেষ্টা করছি, কোনটা আমার পরিবার, আমার সমাজ, বাবা - কাকার স্‌ঙ্গে কী আমার সম্পর্কে, কী আমার পরিচয়, আমি কে।

এই রকম সময়ে ওই সংকলনের অন্তর্গত একটি কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি আমার চোখে পড়ল- আপনারে অহর্নিশি খুঁজি। পরে অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ পঙ্‌ক্তিটির সংস্কার করে লেখেন আপনারে অহরহ খুঁজি - আমার বুকে তিরের মতোএসে মোক্ষম বিঁধেছিল। ঠিক যেন আমার নিজের কথা। কি অব্যর্থ তার প্রবেশ। কী দান তার বিদ্ধতা । কবিতার বিগ্রহ নির্মানে সুধীন্দ্রনাথের কলা- কৌশল নিয়ে বিগত চার দশকে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে অনেক হবে। কিন্তু আমার ষোলো গ্রীষ্মের থেকে পাওয়া সত্যের উপরে বহুদর্শী সুধীন্দ্রনাথের সত্যের সহসা অধিষ্ঠান যেভাবে আমাকে পর্যুদস্ত করে ফেলে তা ছিল আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন পড়লাম,
বমন বিধুর

আমার অনাত্ম দেহ পড়ে আছে মৃন্ময় নরকে

মৌন নিরালোকে
ভুঞ্জে তারা খুশিমতো গৃধ্নু নিশাচর।
দুস্তর, দুস্তর জানি, শাস্তি মোর দুঃসহ দুস্তর।
তখন মনে হল সুধীন্দ্রনাথ কী অমোঘভাবে আমার অস্তিত্বকে, আমার বাল্য ও কৈশোরের সমস্ত অভিমানকে, সমস্ত তিক্ততা ও নৈরাশ্যকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন । মনে হল তাঁর কবিতাতে আমি খুঁজে পেলাম আমার সেই আপনাকে যাকে আমি মনে মনে খুঁজছিলাম, যে আমারই প্রতিচ্ছায়া, কিন্তু আমার অচেনা। এই অনুভবকে আর একটু বিস্তারিত করে বলতে পারি সুধীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতার মধ্যেই আমি খুঁজে পেয়েছিলাম আমার আপন পরিচিত পৃথিবীকে।

দাদা যখন পুজোর ছুটির পর কলকাতায় ফিরে গেলেন তখন আধুনিক বাংলা কবিতা বইখানিও সঙ্গে নিয়ে গেলেন কলেজলাইব্রেরিতে ফেরত দেওয়ার জন্য। আমাদের কলেজ লাইব্রেরিতে সুধীন্দ্রনাথের কোনও বই ছিল না। এদিকে আধুনিক কবিতার প্রকাশক বুদ্ধদেব বসুকে চিঠি লিখে জেনেছি, সুধীন্দ্রনাথের কোনও বই বাজারে পাওয়া যায় না আমার তখন আক্ষেপ হচ্ছিল, কেন ওই সংকলনের কবিতাগুলি টুকে রাখিনি। কোথায় পাই তাঁর আরও কবিতা ক্বয়েখানে যে কাব্যসংগ্রহ পাই সেটাই উলটে দেখি তাতে তাঁর কোনও কবিতা আছেকি না। এইভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রসম্পাদিত প্রেম যুগে যুগে কাব্য সংকলনে পড়লাম সুধন্দ্রনাথের আর - একটি কবিতা-- মোদের সাক্ষাৎ হলো আশ্বিনের রাক্ষসী বেলায়, সমুদ্যত দৈবদুর্বিপাকে। অদ্ভুত প্রেমের কবিতা।

আমি তখন ব্যাকুল হচ্ছি, সুধীন্দ্রনাথের আরও কবিতা কোথায় পাই। এসে গেল ১৯৫১- র গরমের ছুটি। কলেজে পাওয়া বন্ধু নিত্যানন্দকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম পর্যটনে। প্রথমে শান্তিনিকেতনে, তারপর কলকাতায়, গিয়ে উঠিপ্রেমেন্দ্র মিত্রর বাড়িতে। এই পরিভ্রমার কথা আগেই বলেছি। সেবার যে জীবনানন্দের কাছে গেছলাম তার আগেই পড়েছিলাম মহাপৃথিবী ও সাতটি তারার তিমির কাব্যগ্রন্থ দুটি। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম মহাপৃথিবী ও তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থই পড়িনি, তবে আধুনিক বাংলা কবিতার আর প্রেম যুগে যুগের অন্তর্গত কবিতাগুলি ছাড়া সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত পুনর্লিখিত চার- পাঁচটা কৈশোরিক কবিতা পড়েছিলাম। সাহিত্যপত্রের খোঁজ পাওয়াটাও ছিল এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার। এসপ্ল্যানেডে এখন যে - চত্বরটা ঘিরে ট্রামগুলো ঘোরে তখন সেখানে ছিল নিচু তক্তপোশে সাজানো পত্র- পত্রিকার এক বিশাল স্টল, তার চার দিকে ঘুরে ঘুরে বাংলা, ইংরাজি,হিন্দি নতুন নতুন যত পত্রপত্রিকা। সেখানেই সাহিত্যপত্র প্রথম নজরে পড়ে, সেই সংখ্যার মলাটটা ছিল সবুজ, তুলে নিয়ে দেখি মলাটের সূচিপত্রেই রয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দের নাম। সেই সংখ্যায় সুধীন্দ্রনাথের অন্যায় রণে বারবার বিধবস্ত আর তোমার আমার বাড়ির মধ্যে যাবে কবিতা দুটি ছিল বলে মনে পড়ছে। সাকুল্যে তেরো-চোদ্দটি কবিতা পড়ার অভিজ্ঞতা নিয়েই সুধীন্দ্রনাথের কাছ গেছলাম। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাকে অভিভূত করে দিয়েছিলেন মফঃস্বলের থেকে আসা অনভিজ্ঞ তণেরপ্রতি আতিথ্যের অভিনবত্বে ও বদান্যতায়, সম্ভাষণের উদাত্ততায় ও প্রসন্নতায়, সংলাপের সরসতায় ও সহৃদয়তায়।

সুধীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়ার আগে জীবনানন্দের কাছে গেছলাম। তখন তিনি নতিস্ফুট অভিযোগ করেছিলেন যে সুধীন্দ্রবাবু আজকাল লিখছেন না। সে কথা সুধীন্দ্রনাথকে বলাতে তিনি বললেন, লেখার কথা মনের ভেতর জমা হলে আপনিই সেগুলিকে গুছিয়ে প্রকাশের তাগিদ তৈরি হবে। কিন্তু তার জন্য মনটাকে কবিতার উপর রাখতে হয়। বলে এক হাত দিয়ে আরেক হাতের উপর ঢাকনি চাপা দেওয়ার মত একটা ভঙ্গি করে আবার বললেন, সেটা এক রকম হ্যাচিং, তাপ দিয়ে ডিম ফোটানোর --ছানা বের করার জন্য। হ্যাচিঙের সময় চাই, ধৈর্য চাই, আনফরচুনেটলি আমার এখন সে সময় ও ধৈর্য নেই। তাঁর কথা শুনে আমার মনে পড়ল জীবনানন্দের সেই মন্তব্য যে সুধীনবাবু যেভাবে লেখেন তা হৃদয়কে শুদ্ধ করার একটা প্রক্রিয়া। একই কথা না বললেও সুধীন্দ্রনাথও মনের ভার মুক্ত করার কথা, হৃদয়ে জমে ওঠা কথাগুলোকে তা দিয়ে কবিতা করার কথা বলেন।

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমাদের পরিকল্পিত জলার্ক পত্রিকার জন্য লেখা পাওয়ার কোনও আশ্বাসই পেলাম না। জলপাইগুড়ি ফিরে বনবিহারী ও অন্যান্য বন্ধুদের সাথে কথা বলে একটা ফ ন্দি আঁটলাম। অনেক মুশাবিদাকরে তাঁকে একটা মস্ত চিঠি দিলাম আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এক রাশ প্রশ্ন সাজিয়ে। মতলব ছিল যে ঐ চিঠির উত্তর পেলে সেট াই ছাপিয়ে দেব জলার্কতে তাঁর নামে নিবন্ধ হিসাবে। উত্তর এল একখানি রেজিস্টার্ড প্যাকেট। এত মোটা চিঠি, খুলে দেখি, এক কপি উত্তর ফালগুনী। বঝলাম, তাঁর হাতে আমার চিঠি পৌছেছে, তার থেকে আমার ঠিকানা পেয়ে বইখানি প াঠিয়েছেন। কিন্তু উপরে প্রাপকের ও প্রেরকের নাম - ঠিকানা ছাড়া আর কোথাও কিছু লেখা নেই, না কোন চিঠি, না কে ানও উপহারলিপি। ইম্পিরিয়াল সাইজের বোর্ড বাঁধানো একখানি বই, ন্যাড়া ব্রাউন পেপারের মলাট, হয়তো উপরে কোনও জ্যাকেট ছিল । কোন সাহিত্যিকের কাছ থেকে নিজের লেখা বই পাওয়া আমার জীবনে সেই প্রথম। না-ই বা থ াকল তাতে উপহারদাতার স্বাক্ষর, তবু ওইভাবে বই পাওয়ার রোমাঞ্চই আলাদা।

আর সেই প্রথম সুধীন্দ্রনাথের এতগুলি কবিতা একসঙ্গে পড়লাম। দুটি জিনিস বিশেষভাবে খেয়াল করলাম। তাঁর ক াব্যের অনেক খানি জুড়ে রয়েছে মরণ চিন্তা। এই উত্তর ফাল্গুনিতেই রয়েছে মাতাল - তরনী নামে একটি কবিতা যা সচেতনভাবে সোনার তরী কবিতাটির অনুষঙ্গে রচিত-- মরণ, সোনার তরনী তোমার ঠেকেছে কি মোর ঘাটে ? অন্য একটি কবিতার নাম মহানিশা, আর তার শুই হয়েছে, মরণ তুমি আসবে একদিন, এসো তবে আজ বেগে। মনে পড়ল কবিতায় প্রকাশিত পুনর্লিখিত কৈশোরিক কবিতাগুলির মধ্যে একটির নাম ছিল অসময়ে আহ্বন আর সেটির প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তি ছিল, মরণ আমারে দিয়েছে আজকে ডাক। এই কবিতাই কিন্তু মরণের আহ্বান করার বদলে প্রত্যখ্যানই্ করা হয়েছে। অনুমতি দাও আরও কিছু কাল থাকি বিশাল বিশ্ব বিস্ফারি দুই আঁখি, ডেকো না, মরণ, এখন সন্নিধানে। এই রকম এই জীবনের প্রতি আসক্তিতে বিশিষ্ট কবিতা সুধীন্দ্রনাথ খুব কমই লিখেছেন। উত্তরফালগুনী থেকে অপর যে - জিনিসটি চোখে এল সেটা হল গদ্যছন্দের প্রতি তাঁর অস্বীকৃতি বা বিরাগ। কলকাতায় প্রথম আলাপের সময় তিনি বলেছিলেন পরি চয় প্রত্রিকা প্রকাশ করার পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল আধুনিকতাকে বাংলায় নিয়ে আসা আর কবিতায় একটা আধুনিক রূপ যে গদ্যকবিতা তা অনস্বীকার্য, অথচ সুধীন্দ্রনাথের একটা কাব্যগ্রন্থে গদ্যচছন্দে লেখা একটি কবিতা দেখতে পেলাম না। আর আগের চিঠি পুনরাবৃত্তি করে তাঁকে আবার চিঠি দিলাম , উত্তরফালগুনীর জন্য কৃতজ্ঞতা জা নিয়ে আর তাঁর মরণচিন্তাচছন্নতা ও গদ্যচছন্দের প্রতি নিস্পৃহতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে।

বেশ কিছু দিন কেটে গেল। অপর পক্ষ থেকে কোন সাড়া নেই। ইতি মধ্যে জীবনানন্দ পাঠিয়ে দিয়েছেন "শিরীষের ড ালপালা লেগে আছে বিকেলের মেঘে" কবিতাটি। জীবনানন্দের কবিতা আমাদের ঝিমিয়ে পড়া উৎসাহে নতুন ইন্ধন জে াগাল। সুধীন্দ্রনাথ আমায় সাবধান করে দিয়ে ছিলেন মাসিক পত্রিকা বের ক রতে হলে মেটাতে হবে অনেক চাহিদা। একটা চাহিদা হল প্রত্রিকার জন্য লেখার নিয়মিত জোগান। অন্যটা হল টাকা। তাঁর কথা যে কতসত্য তা কাজে নেমে টের পেলাম। জলপাইগুড়িতে চা বাগানের দৌলতে টাকাওয়ালা ভদ্রলোকের অভাব ছিলনা। কিন্তু অভাব ছিল কলেজে পড়া ছেলেদের হাত সাহিত্য পত্রিকা বাবদ টাকা দেওয়ার মতো বড়লোকের। আমরা প্রথমেই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে পত্রিক ার জন্য টাকা নিতে চাইনি। তবে সুধীন্দ্রনাথকেও আর চিঠির উত্তরের জন্য তাগিদ দিইনি।

তবু এক শীতের বিকেলে তাঁর চিঠি পেলাম। প্রথমে বুঝতে পারিনি। স্বাভাবিক মাপের চেয়ে একটু বড় মাপের চৌকো ধরনের খাম। মাথার দিকে ডান কোনে তিন টে টিকিট সাঁটা। খামের গায়ে গোটা গোটা খাড়া খাড়া ইংরেজি হরফে অ ামার নাম ও ঠিকানা। কিন্তু কে পাঠিয়েছে তার কোন হদিস নেই খামের বাইরে। খুলে দেখি সুধীন্দ্রনাথের চিঠি। ঋজু, তীক্ষ্ন ও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখেছেন,

কল্যাণীয়েষু,
তোমার চিঠির জবার দিতে এত দেরী হলো বলে অপরাধ নিও না। সাত-আট মাস অসুস্থ ছিলুম। ফলে অফিসে অনেক ক

াজ জমে গেছে এবং সে কাজের বেশ খানিক টা কলকাতায় বসে শেষ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ দুমাসে বেশ কয়েক বার ব াইরে যেতে হয়েছে এবং এই অবস্থার মধ্যে চিঠি লেখার সুযোগ করে উঠতে পারিনি । তা ছাড়া তোমার প্রশ্নগুলির যথো চিত জবাব দিতে গেলে প্রবন্ধ লেখা ছাড়া উপায় নেই এবং তার সময় কোথায় ?
তবু সংক্ষেপে বলে রাখি সম্প্রতি বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি সন্দিহান হয়েছি। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত অ ামি এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলুম। কিন্তু সেকালের যে - সব তণ কবিদের মধ্যে আমরা অপার সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছিলুম তঁ াদের অধিকাংশই অন্তত আমার আশাভঙ্গ ঘটিয়েছেন। তবে এ অভিযোগ শুধু মাত্র বাঙ্গালী কবিদের সম্পর্কেই খাটে না, আজকালকার পাশ্চাত্য লেখকরাও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন। একমাত্র এলিয়টই পরিণতির দিকে প্রাগ্রসর।

বাংলা গল্প উপন্যাস আমি বড় একটা পড়ি না। হয়তো সেই জন্যই এখনো পর্যন্ত এই ধারনাই আমার মনে বদ্ধমূল যে গে ারাই বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ছোটো গল্পের অভাব আমাদের ভাষায় নেই, এবং এখনভাল ছোটো গল্প নিশ্চ য়ই লেখা হয়, যদিও ..প্রগতির মোহে একাধিক নাম করা লেখক এখন পথভ্রষ্ট। কিন্তু পশ্চিমেও অপকর্মের যুগ চলছে, এবং ইংরেজী বা ফরাসীতে সম্প্রতি কোনো প্রথম শ্রেনীর উপন্যাস পড়েছি বলে মনে নেই।

আমার বইগুলোর পুনর্মুদ্রণ সম্বন্ধে এখানে কোনো বন্দোবস্ত হয়নি। আশা আছে কোনো এক দিন হবে কিন্তু কবে বলতে পারি না।

আড়াই বছর হলো স্টেট্ সম্যানের কাজ ছেড়ে দিয়ে, আমি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে চাকরি নিয়েছি। কিন্তু অফিসের জন্যই যে আমি আজকাল লিখি না, তা নয়। লেখার বিশেষ কিছু নেই বলে আমার কলম আর চলে না
তোমার কুশল কামনা করি। ইতি ৯.১.৫২
শুভার্থী
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

গদ্যচ্ছন্দ আমার অসহ্য লাগে, এবং পদ্যচ্ছন্দে
স্খলন - পতন - ত্রটির অবকাশ নেই বলেই আমার বিশ্বাস

এইটেই আমাকে লেখা সুধীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠি। ভেবেছিলাম, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে পত্রাকারে তাঁর বিস্তা রিত মতামত পেলে আমাদের জলার্কতে তা প্রকাশ করে দেব। কিন্তু চিঠির আকার যা তাতে একটা স্বতন্ত্র রচনা হিসাবে পত্রিকায় ছাপা যায় না । চিঠি থেকে এটাও জানা গেল যে তাঁর বইগুলো পুনর্মুদ্রণের কোনও ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত হয়নি। কতদিনে যে তাঁর আরও কবিতা পড়তে পারব কে জানে।
সে বছরের বসন্তকালে তিনটে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রথমটা তো বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা। পাকিস্তানে ঢাকা শহরের রাজপথে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালায় পাকিস্তান পুলিশ বাহিনী। দ্বিতীয় টা হল জলপাই গুড়ি কলেজ থেকে আমার আই-এ পরীক্ষা দেওয়া। আর আই - এ পরীক্ষার পরে পরে কলকাতা রেডিয়োতে সুধীন্দ্রন াথের কবিতা আবৃত্তি ছিল তৃতীয় ঘটনা। নিজের কবিতা নয়, তিনি আবৃত্তি কোরে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ..মহুয়া.. কাব্যগ্রন্থ থেকে সুন্দরী তমি শুকতারা আর যেথায় তুমি জ্ঞানী কবিতা দুটি। সম্ভবত তিনি বাংলা সাহিত্যের বাতাবরণে অথবা সা হিত্যিক দের সমাবেশে পুনঃপ্রবেশের ভূমিকা রচনায় উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন এবং কবিতা পাঠের জন্য বেতার-কেন্দ্রে অ াগমন ছিল তার প্রমান। এই তৃতীয় ঘটনার অব্যবহিত পরে--বোধহয় পরীক্ষা হয়েযাওয়ার পরে একটা অবকাশ পেয়ে-- আমি কলকাতায় পৌঁছে প্রথমেই গিয়ে হাজির হলাম প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে। তিনি ছিলেন দুনিয়ার প্রেমেনদা । অন্তরঙ্গ আপ্যায়ন, বৌদির গভীর মতামত ও স্নেহ, ছেলেদের সাহস সৌহার্দ্য --সব মিলে সে বাড়ির একটা দুর্বার আকর্ষন ছিল।

তখন বাংলা নাট্যমঞ্চের মস্ত বড় এক অভিনেতার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং কাকার মতো মঞ্চে গেলে তিনি শিশির ভাদুড়ীরা সঙ্গে পাল্লা দিতেন। কেন যে সেবার সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়নি তা আজ আর মনে নেই। জলপাইগুড়ি ফিরে এসে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মন্তব্যটার কথা জানাই। তাঁকে লিখেছিলাম যে প্রেমেন্দ্রর ওই মন্তব্যে আমি উল্লাসত হলেও আমার মধ্যে আরো একটা সত্তা আছে, দ্বিতীয় এক সুরজিৎ,যার মনে সন্দেহ আছে যে সুধীন্দ্রনাথ মঞ্চে যোগ দিলে শিশির ভাদুড়ীর প্রতিভাকে যথার্থই প্রতিস্পর্ধা জানতে পারতকিনা। আমি তাই আমার চিঠিতে সন্দেহদ্যোতক ..নাকি.. শব্দটা ব্যবহার করেছিলাম। উত্তরে তিনি লিখেছিলেন,

প্রিয়বরেষু
তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি, কিন্তু তার চেয়েও খুশী হয়েছি দ্বিতীয় সুরজিতের ..নাকি.. ব্যবহারে । কারন আমার সম্বন্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মতামত তাঁরই অসামান্য উদারতার পরিচয়, আমার গুণের সাক্ষ্য নয়।

আমি শ্রীঘ্রই পাঁচ মাসের ছুটিতে দেশের বাইরে যাচ্ছি। বিধি- বন্দোবস্তের শেষ এখনো দেখতে পারছিনা এবং অফিসের কাজের ভিড় বেজায়। তাই আমার বই গুলি পুনর্মুদ্রণ উপস্থিত বন্ধ রইল, ফিরে এসে সেই বিষয় যথাকর্তব্য করা যাবে।

ঐ একই কারণে তোমাকে আজ বড় চিঠি লিখতে পারলুম না। আশাকরি সেই জন্য অপরাধ নেবে না। কলকাতায় যদি অক্টোবর নাগাদ আসো, তাহলে দেখা করতে ভুলো না।

তোমার কুশল কামনা করি
ইতি ২৩ এপ্রিল ১৯৫২
বশংবদ
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আই . এ. পাশ করে আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হই। ততদিন গরমের ছুটি ফুরিয়ে কলেজ শু হয়ে গিয়েছে। দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য স্কটিশের কোনও হোস্টেলে জায়গা পাওয়া গেল না। দীপক মজুমদারের পাল্লয় পড়ে বর্ষা দেখবার জন্য শান্তিনিকেতন যাই। তখন অন্নদাশঙ্কর কলকাতার হস্টেল সমস্যার সমাধান হিসেবে আমাকে বিভারতীতে ভর্তি হবার পরামর্শ দিলেন। হুজুগ করে শান্তিনিকেতনে বর্ষা দেখতে গিয়ে কীভাবে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বিভারতীতে ভর্তি হয়ে যাই সে বৃত্তান্ত আগেই লিখেছি। মাস দেড়েক ক্লাস করার পরে পূজোর ছুটি। তখন জলপাইগুড়ি যাওয়ার আগে একবার কলকাতায় যাই। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও জীবনানন্দের সঙ্গে দেখা করি। সুধীন্দ্রনাথের ফ্ল্যাটে যাই। যতই কলিং বেল বাজাই, দরজা আর খোলে না।

সে বছর হিষ্ট্রি কংগ্রেস হয় ভাইজাগে।পৌষ মেলার পরে অধ্যাপক সন্তোষ বসুর নেতৃত্বে আমরা কয়েক জন কংগ্রেসে যোগ দিতে যাই। সন্তোষদা ছিলেন বামপন্থী কবিদের অনুরাগী। আমি অনুভব করি তাঁর প্রিয় কবিদের লেখায় বক্তব্য যতটা কবিত্ব ততটা নয়। এই নিয়ে সন্তোষদার সঙ্গে আমার মতপার্থক্য ছিল। হিষ্ট্রি কংগ্রেস থেকে ফেরার পথে আমি থেকে যাই কলকাতা, অন্যেরা চলে যায় শান্তিনিকেতনে। কলকাতায় আমার থেকে যাওয়ার কারণ ছিল বিশেষভাবে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করা। এতদিন তিনি নিশ্চয়ই বিদেশ ভ্রমণসেরে ফিরে এসেছেন। যা কামনা করছিলাম তা-ই হলো। সুধীন্দ্রনাথ ঘরেই ছিলেন । যাত্রা করে ছিলেন জাহাজে জল পথে। কলম্বে হয়ে লন্ডনে। তার পর অনেক নতুন নতুন দেশ ঘুরে এসেছেন। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইৎসারল্যান্ড, ইটালি, গ্রিস, তুরস্ক প্রভৃতি। অনেক কবি সাহিত্যিক চিত্রশিল্পীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে। বললাম, একটি ভ্রমণ কাহিনী লিখুন। তাতে হেসে বললেন, ট্রাভেলগ ইজ নট মাই কাপ অব টী। ভ্রমণ অভিজ্ঞতার যদি কিছু লিখতে হয় তা হলে বলব কবিতা লেখাই ভালো। কিংবা ফিকশন। কিন্তু তার জন্য

এক্সপেরিয়েন্সগুলোর ইমোশনে পরিণত হওয়া দরকার। আমি ইতিমধ্যে বিশ্বভারতীতে ভর্তি হয়েছি শুনে খুব খুশি হলেন। বললেন যে সেখানকার বিশাল গ্রন্থাগার একেবারে অবাধ ছিল একদা , গভর্ণমেন্ট নেওয়ার পরেও যদি তেমনই নিবারণ থেকে থাকে তা হলে যেন ওই গ্রন্থাগারের গলিতে গলিতে সময় কাটাই। এ রকম সুযোগ জীবনে বেশী আসে না। রিকুইজিশন করে বইয়ের পাহাড় নিয়ে বসে থাকার সঙ্গে ওপেন লাইব্রেরিতে বেরিয়ে বই পড়ার থ্রীলে আকাশ-পাতাল পার্থক্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হয়।

পৌষ মেলার সময়ই শুনেছিলাম সামনের বসন্তে সাহিত্যমেলার আয়োজন চলছে। সেই যে একুশে ফ্রেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে বাংলা ভাষার জন্য চার তণ প্রাণ দিয়ে শহিদ হলেন তার এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দুই বাংলার সাহিত্যিকদের মেলামেশার প্রাঙ্গন হবে শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলা। আমার মনে পড়ল বাহান্ন সালের গরমের সময় যখন অন্নদাশঙ্কর দার্জিলিঙে আসেন তখন আমরা কয়েক জন শিলিগুড়ি থেকে দেখা করতে গেলে তিনি একুশে ফ্রেব্রুয়ারি নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। সব কথা মনে নেই। সুধু একটা কথা খুব স্পষ্ট মনে আছে। একুশে ফ্রেব্রুয়ারি প্রমাণ করে দিল ধর্মঘট একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার আর ভাষার প্রশ্নটা সমাজগত। তখন থেকে একুশি ফ্রেব্রুয়ারি তার মানে একটা সম্ভাবনাগর্ভ বীজের মতো অঙ্কুরিত হচ্ছিল। সেই বীজের প্রথম অঙ্কুরোদ্‌গম ছিল শান্তিনিকেতনের সাহিত্য মেলা। আমাকে কেউ না বলা সত্ত্বেও আমি সুধীন্দ্রনাথকে সেই মেলায় আসার জন্য আমন্ত্রন জানাই। তিনি এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বললেন, দ্যাট নট পসিবল। এমনই তৎক্ষণাৎ তিনি অক্ষমতা জানালেনযে আমি আরকিছু জিজ্ঞাসা করতেই পারলাম না । ভাবলাম এই সেই দিন বিদেশ ভ্রমণের জন্য লম্বা ছুটি নেওয়ার পরে তার পক্ষে আবার শান্তিনিকেতন সাহিত্যমেলার নাম করে ছুটি নেওয়া সম্ভব নয়, অন্তত আমার আমন্ত্রণে নয়। তবে সাহিত্যমেলার কাব্যশাখার আহ্বায়ক অশোকবিজয় রাহা যদি তাঁকে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানান তাহলে তিনি আসতে পারেন। অশোকদাকে সে - কথা বলতে তিনি যেন উদাসীনভাবে বললেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্তকি আসবেন! তিনি তো বাংলা সাহিত্য থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছেন। তাঁর বলার ধরনে আমার সন্দেহ হল, এব্যাপারে
তাঁর বুঝি তেমন আগ্রহই নেই। ক্রমে ক্রমে এর ওর কাছে শুনে জানলাম শান্তিনিকেতনের ছাত্রী রাজ্ঞেরী বাসুদেবকে তিনি যেভাবে বিয়ে করেন সেটা নাকি অনেক আশ্রমিকই ক্ষমা করতে পারেননি। হয়তো আসল কারণটা চেপে রেখে অশোকদা বলেছিলেন বাংলা সাহিত্য থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নেওয়ার কারণটা।

মনে করার সঙ্গত কারণ আছে নিজের পুরনো লেখা ঘষামাজা করে, বিদেশী কবিদের কবিতা অনুবাদ করে, বাংলাকবিতা আবৃত্তির আসরে যোগ দিয়ে, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, শিবনারায়ণ রায় প্রমুখ সাহিত্যিক ও সাহিত্যপাঠকদের সঙ্গে যোগাযোগপুনদ্ধার করে এবং বিদেশে গিয়ে বিদেশি সাহিত্যিক সমালোচক ও শিল্পীদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করে সুধীন্দ্রনাথের মানসে, মৌচাকে মধু জমার মতো, লেখার পর্যাপ্ত কথা জমতে শু করেছিল। ভ্রমণ সেরে দেশে ফিরে তিনি আবার কবিতা লেখার কথা ভেবেছেন সেটা আমার মনে হয়েছিল ভাইজাগ থেকে ঘরে ফিরে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করি তখনি তিনি যেসব কথা বলছিলেন সেসব শুনে। ভ্রমণের বৃত্তান্তকে পান্তরিত করতে চেয়েছিলেন রসের বস্তুতে। প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁর প্রথম কবিতা ..যযাতি.. । যতদুর জানি ডাইরি লেখা তার ধাতে ছিলনা। কিন্তুকবে কোনকবিতা শেষ করেন তার নিচে লিখে রাখতেন। ..যযাতি লেখা শেষ করেন ১৯৫৩-র ১৮ মার্চ । কিন্তু লেখাশু করেন কবে?নিশ্চয়ই ওই একই দিনে নয়। অমন দীর্ঘ কবিতা কারও পক্ষেইএক দিনে লেখা সম্ভব নয়, আর সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে তো সম্ভব নয়ই। দিনের পরের দিন একট প্রসঙ্গ চিন্তা করে , রূপাঙ্গটা অনেক খেটে খেটে সাজিয়ে কবিতা লিখতেন তিনি, কবিতা রচনা ছিল তাঁর কাছে কঠোর সাধনার বিষয়।একদিন তিনি কথাচ্ছলেই কবুল করেন যে ..যযাতি.. লেখা শু করেছিলেন বিদেশ ভ্রমণ সেরে আসার মাসখানেকপরে, লিখতে মোট চার- পাঁচ মাস লেগেছে। কিন্তু আমি আশর্চ্য হব না যদি কোনও দিন এমন সূত্র বেরিয়ে পড়ে যে ১৯৫২-র মে- জুন মাস লন্ডন কি ব্রাসেলসে এই কবিতার বীজ পড়েছিল তাঁর উর্বর মনোভুমিতে। ..যযাতি.. বেরিয়েছিল ..কবিতা.. পত্রিকার চৈত্র ১৩৫৯ অর্থাৎ মার্চ- এপ্রিল ১৯৫৩ সংখ্যায়, কিন্তু সংখ্যাটি পাঠকদের হাতে মে মাসের আগে পৌঁছয়নি, তবে বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অণকুমার সরকার, নরেশ

গুহ প্রমুখ ..কবিতার ..ভেতরের মানুষরা নিশ্চয়ই সেটি প্রকাশের আগে পড়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং হয়তো বুঝেছিলেন যে যযাতির প্রকাশ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা হতে চলেছে। ..কবিতা.. চৈত্র ১৩৫৯ সংখ্যা প্রকাশের আগেই সুধীন্দ্রনাথ ..উন্মার্গ.. কবিতাটি লেখেন। এক বছর আগে জাহাজে চড়ে সমুদ্র পথে বিদেশযাত্রার থেকেওঠা নানা ভাব - ভাবনার ছায়াপাত হয়েছে ..উন্মার্গতে। আমার মনে হয়, উন্মার্গ লিখে তিনি সন্তুষ্ট হননি, তাতে তাঁর ভ্রমণের চিত্রকল্পটা স্পষ্ট হয়নি, হয়ত তাই বিংশ শতাব্দীর মধ্যলগ্নে বিশ্ব ভ্রমণের কবিতা রূপে লিখলেন ..প্রত্যাবর্তন.. কবিতাটি । অশোকদা বলেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছেন । কিন্তু সেই বছরেই যুদ্ধযাত্রায় নির্গত পথভ্রান্ত সম্রাটের অবশেষে স্বরাজ্যের পথলাভের মতো সুধীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে সগৌরবে প্রত্যাবর্তন করলেন ।

এখন অশোকদার বিষয়েও একটা কথা বলা দরকার। ..যযাতি .. প্রকাশের পরে তিনি কবিতাটির গঠনকৌশলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন, ..একেবারে মহা কবিদের মতো---- এ কবিতা লেখা কোনও লিরিক কবির প্রতিভায় কুলোত না। সেই সঙ্গে অকপটে স্বীকার করলেন যে সুধীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে .. স্বেচ্ছানির্বাসনের কথাটা তুলে তিনি ভুল করেছিলেন। অশোকদা নিজে ছিলেন যেমন অসাধারণ লিরিক কবি তেমনই অসাধারণ অধ্যাপক। তাঁর ছাত্র হতে পারাটাও এক অসাধারণ সৌভাগ্যের ব্যাপার।

এদিকে একদিন চা-চক্রে ভুলুদা আর অমিতদার মধ্যে ..যযাতির গুণাগুণ নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা তর্কাতর্কির পর্যায়েচলে গেল। বোঝা গেল .. যযাতির প্রকাশ একটা ঘটনা । সেই বছরেই বর্ষার সময়ে প্রকাশিত হয় .. সংবর্ত.. কাব্যগ্রন্থ রূপে নির্বাচন করে বাংলার সারস্বত সমাজ সরগরম হয়ে উঠল ধ্রুপদী কবি সুধীন্দ্রনাথের পুনরাবির্ভাবে। দু বছরের মধ্যে .. সংবর্তর দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ব্যাপারটা ছিল খুবই বিস্ময়কর, কারণ বন্ধুমহলেও তিনি দুর্বোধ্য বলে নিন্দিত ছিলেন।.. সংবর্তর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আগেই .. অকেষ্ট্রা.. কাব্যগ্রন্থের বহুল পরিমার্জিত নবীন সংস্করণও প্রকাশিত হয় আর তার পিঠোপিঠি ..প্রতিধবনির প্রথম মুদ্রণ। দেখা গেল শেষোক্ত দুটো বইয়েরই মলাট করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। তখন অবশ্য সত্যজিৎ রায় প্রচ্ছদপটের শিল্পীরূপেই বিখাত ছিলেন, চলচ্চিত্র - নির্মাতা হিসেবে তাঁর খ্যাতির সূচনা হয় আরও পরে। ঘটনা এইযে সাধারন পাঠক মহলে যিনি১৯৫৪ সালেরশুরুতে অখ্যাত ছিলেন তিনি ১৯৫৫-র মাঝামঝি বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। কিন্তু এখন ফিরে যাই ১৯৫৩ সালে।
আমার তখন কৌতূহল হয় যে .. সংবর্তর কবি যাত্রা শু করেছিলেন কোন গিরিশৃঙ্গ থেকে তা একবার সন্ধান করেদেখা দরকার। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার ঘেঁটে বের করলাম কাপড়ে বাঁধানো ..তন্বী বইখানি যার উৎসর্গ ছিল এই রকম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্ঘ্য । ঋণশোধের জন্য নয় ঋণস্বীকারের জন্য। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তারিখও নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু এতো দিন বাদে তা আর মনে নেই। তারপর কয়েক টি কবিতা পড়ে বুঝলাম রবীন্দ্রনাথের জটা থেকে বেবিয়েছে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যধারা। সেই গ্রন্থাগারের একটা ঘরে বসতেন রবীন্দ্রজীবনী-- কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁরও লম্বা লম্বা চুল দাড়ি ছিল রবীন্দ্রনাথের মতো। নিজের ঘরে এক ঠায় বসে বসে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন তখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখতেন গ্রন্থাগারের কোনখানে কে কি করছে। তিনি তেমন গন্থাগারিক ছিলেন ঘুরে গ্রন্থাগারের অবস্থা নিজে পরিদর্শন করতেন। আমাকে জানলার পাটায় বসে বই পড়তে দেখে তিনি কাছে এসে দাঁড়াতেই আমি শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সুধীন্দ্রনাথের .. তন্বী .. পড়ছি দেখে প্রথমে আমার নামধাম জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বললেন, সুধীন্দ্রনাথকে ও বই পড়ে চিনতে পারবে না।.. স্বগত.. পড়েছ? পড়লে দেখবে সাহিত্যের সঙ্গে পন্ডিতের মিলন কীভাবে হয়। একটু থেমে আবার বললেন, .. সাহিত্য শুধু ইমোশনের প্রকাশ নয়, সাহিত্য মানে ইনটেলেকচুয়ালিজম।.. তাঁর কথায় আমি .. স্বগত.. বইটি খুঁজে বের করি। তার আদি মলাটের বদলে ছিল লাইব্রেরির নতুন বাঁধাই, মলাটে সবুজ মার্বেল পেপার। ঘরে ফিরে পড়তে গিয়ে দেখি তার সূচনাতেই আপন রচনা- রীতিকে প্রথমে .. অস্পৃশ্য.. ও পরে .. হরিজন..বলে চিহিত করেছেন। সাহিত্যের জগতে ওই দুটি শব্দ অবশ্যই অভিনব, কিন্তু ত্রিশের দশকে গান্ধীজি যে সামাজিক আন্দোলন শু করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে ওই দুটি শব্দের ব্যঞ্জনা কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল তার প্রমাণ সুধীন্দ্রন

াথের ওই প্রয়োগ। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা প্রথম পড়ার সময় থেকে বুঝেছিলাম যে শব্দকে তিনি কমই চলতি বা বাজারি অর্থে ব্যবহার করেন, সাধারণত শব্দকে তিনি এমনভাবে উল্লেখ করেন যাতে তা বাজারের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে। .. স্বগত.. পড়ে আরও দেখলাম অভিপ্রেত অর্থে শব্দের পর শব্দকে তিনি এমনভাবে সাজান যাতে বাক্যের গঠনে ধ্রুপদী স্থাপত্যের অনিবার্যতা ও সম্বদ্ধতা, সরলতা ও সবলতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর- একটা কথা মনে হওয়াতে আশ্চর্য হলাম। .. স্বগত..র বাক্য গঠনের শৈলীর হঙ্গে যেন .. যযাতি.. কবিতাটির শব্দ বিন্যাসের শৈলীর একটা সাদৃশ্য আছে। বোঝা যায়, বিষয় ও সময় পালটালেও .. স্বগত.. প্রবন্ধগ্রন্থ আর যযাতির কবি আসলে একই ব্যক্তি।

এর আগে আমার .. সংবর্ত.. কাব্যগ্রন্থখানি পড়া হয়ে গিয়েছিল। ওই গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ..যযাতি.., ..উন্মার্গ.. ও .. প্রত্যাবর্তন.. এই দিনটে তিপ্পান্ন সালে লেখা নতুন কবিতা। ..সংবর্ত.. গ্রন্থটি পাঠের সঙ্গে যুক্ত হল ..স্বগত.. পাঠের অভিজ্ঞতা। ..স্বগত.. পড়ে বুঝতে পারিনি যে মালার্মে কর্তৃক সুধীন্দ্রনাথ কতখানি অনুপ্রাণিত । অথচ ..সংবর্তর মুখবন্ধে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ..মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট, আমি মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ.. এবং সেবারেই ..কবিতা.. পত্রিকার শরৎ সংখায় প্রকাশিত হয় মালার্মে অবলম্বনে সুধীন্দ্রনাথের ..ফন - এর দিবাস্বপ্ন.. কবিতাটি, সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ রচিত দীর্ঘ ভাষ্য। বাংলায় ব্যাপক মালার্মে চর্চার শু সেই থেকে। কিন্তু মালার্মে চর্চার আগেই আমি ..সংবর্ত.. গ্রন্থটির সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমরা মতা মত জানিয়ে লিখেছিলাম যে .. জলার্ক-তে গ্রন্থটির বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই, সেই জন্য এক কপি বই পেলে ভালো হয়। উত্তর নেই। ইতি মধ্যে আমি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে জার্মান কবি স্তেফান গেয়র্গের একটি কাব্যগ্রন্থ পাই। উলটে পালটে দেখি প্রথম জীবনে তাঁর উপরে মালার্মের গভীর প্রভাব পড়েছিল। তখন গেয়র্গের দুটি কবিতা সুধীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিয়ে অনুবাদ করে দিতে অনুরোধ করলাম। সেই সময় সুধীন্দ্রনাথ ..সাহিত্যপত্র.., উত্তরসূরী..,কবিতা.., প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন বিদেশি কবির কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করছিলেন। ফন-এর ..দিবাস্বপ্ন.. ছাড়া প্রায় সবই অবশ্য ছিল আগে করা অনুবাদের সংস্কার করা নতুন পাঠ। ভেবেছিলাম মালার্মের অনুসারী গেয়র্গের কবিতা আর - এক মালার্মে- পন্থী ভাষান্তর করে দেবেন। আগের চিঠির জবাব না পেলেও এবার আমার চিঠি পেয়েই লিখলেন,

প্রিয়বরেষু
নানা ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত আছি বলে তোমার চিঠির জবাব দিতে পারিনি, আজ আর একখানি চিঠি এসে আমার ঋণ বাড়িয়ে দিল।

সংবর্ত সম্বন্ধে তোমার মতামত পড়ে গর্ব অনুভব করছি। কিন্তু আমার লেখায় এখনও অনেক দোষ ও দুর্বলতা আছে, যদিচ দুর্বোধ্যতা আমার বিবেচনায় অন্যতম নয়। আমার বিশ্বাস একটু ধৈর্য ধরে পড়লে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন্ কথা কেন লেখা হয়েছে ভেবে নিলে প্রথমে যা কঠিন ঠেকে, তা সরল হয়ে আসবে। কিন্তু স্বপক্ষে ওকালতি হাস্যকর, তোমার লিখিত মন্তব্যের জন্যে কৌতূহলী হয়ে রইলুম।

সমালোচনা করবেন বলে দু-একখানি পত্রিকা সংবর্ত চেয়েছিলেন। দিলীপ গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে কথা কয়ে বুঝেছি যে সিগ্নেট্ প্রেস সমালোচনার জন্যে বই পাঠান না সাধারণত। তাই আমার তরফ থেকে কোনো কাগজকেবই দিইনি, এবং এখন জলার্ক ইত্যাদির জন্যে যদি দিই তাঁদের কাছে অপরাধী হতে হবে।

তোমার মন নানা কারণে চঞ্চল হয়ে আছে জেনে দুঃখিত হলুম। আশা করি বর্তমান উদ্বেগ সাময়িক । ইতি ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩

ভবদীয়

পুঃ উপস্থিত খুবই ব্যস্ত আছি, অসাহিত্যিক ঝামেলায়। এখন গেয়র্গের অনুবাদ সম্ভব নয়। সে জন্যে ক্ষমা কোরো।

শান্তিনিকেতনে পুজোর ছুটির সময় ..ফন-এর দিবাস্বপ্ন.. প্রথম প্রকাশিত হয় .. কবিতা.. পত্রিকায়। আমি তখন জলপাইগুড়িতে মায়ের কাছে। মাকে প্রথম জানাই এক আশর্চ্য জটিল রহস্যময় কবিতা লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ। মাকে ছাড়া আর কাকে আমার বিমুঢ়তা জানাতাম ক্ক মা বললেন .. আবার মন দিয়ে পড়ো..। সুধীন্দ্রনাথ যদি বাংলায় মালার্মে চর্চা ..সংবর্তর মুখবন্ধে শু করে থাকেন তা হলে .. ফন-এর দিবাস্বপ্ন.. তার সর্বোচচ শিখর। ওটা ছাড়া সুধীন্দ্রনাথ আরো কয়েকটি মালার্মের কবিতা বাংলায় ভাষান্তর করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে তখন বিদ্যাভবনের একজন তুর্কি রিসার্চ - স্কলার ছিলেন, নাম ভুলে গেছি, বোধহয় গ্রোভার কি গোহেন বা ওই রকম কিছু ছিল। তিনি আমাকেফরাসি শেখাতেন, আমি তাকে বাংলা শেখাতাম। তাঁর সাহায্যে আমি জ্ঞান লাভ করেছিলাম, মালার্মের অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথ অনেকখানি স্বাধীনতা নিতেন এবং তাঁর মালার্মের অনুবাদগুলিও তাঁর মূল রচনা বলেই গণনীয়। গিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে মালার্মেকে সামনে রেখে সুধীন্দ্রনাথ বাংলায় কাব্যতত্ত্বের বিচারে এক সম্পূর্ণ নতুন মাত্রাযোগ করেন এবং অণকুমার সরকার প্রমুখ তণ কবিরা মালার্মের কাব্য-জিজ্ঞাসা নিয়ে বিতর্কে নেমে ফপড়েন। যাহোক, সেবার পুজোর ছুটিতে জলপাইগুড়ি গিয়ে সুধীন্দ্রনাথকে ..ফন-এর দিবাস্বপ্ন.. ও ,মালার্মের অন্যান্য অনুবাদগুলি নিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। তিনি লিখলেন, .. তোমার ২৭ তারিখের চিঠি এই মাত্র এল। আগের চিঠি যথা সময় পেয়েছিলুম, কিন্তু নিতান্ত সময়াভাবে জবাব দিতে পারিনি ক্ষমা কোরো।
মালার্মের কবিতা তোমার ভালো লেগেছে জেনে আশ্বস্ত হলুম। আমার স্বভাবে আত্মবিশ্বাসের পবিমাণ অপেক্ষাকৃত কম , তাই নিজের লেখা সম্বন্ধে নিজের মত আমার প্রায়ই নেই।
কোন কবিতার যথাযথ অনুবাদ আমার বিবেচনায় অসম্ভব। অবশ্য মুলের যথাসাধ্য অনুসরন অনুবাদকমাত্রের কর্তব্য, তবু এই চেষ্টায় ফল শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায়, তা সার্থক হলে, তাকে আর তর্জমা বলা চলে না। তাই আজকাল আমি সব অনুবাদের শিরোনামায় অবলম্বন শব্দটা জুড়ে দিই।

আশা করি ছুটি আনন্দে কাটছে। শান্তিনিকেতনে ফেরার পথে দেখা করে যেও।

ইতি ২৩ অক্টোবর ১৯৫৩
ভবদীয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

..সংবর্তর ভূমিকা থেকে মালার্মে - চর্চা শু হয় তেমনই ..সংবর্ত.. প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে সুধীন্দ্রনাথ চর্চাও আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ - চর্চার একাংশ ছিল তাঁর পক্ষে, অপরাংশ বিপক্ষে ছিল। একজনের বিরূপ সমালোচনায় আমি বিশেষভাবে বিচলিত হয়েছিলাম। কারন তাঁকে আমি একজন ভালো কবি বলে জানতাম। এবং কবিতার কলা-কৌশলের উপর তাঁর দখল দেখে তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম। তা ছাড়া সমাজতন্ত্রের উপর বিশ্বাস আমি তাঁর নিকটবর্তী ছিলাম। অথচ আমি যে দুজন বাঙালি কবিকে সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ কবি মনে করতাম সেই জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমার পক্ষে মহাঅশান্তির কারণ হয়েছিল। অমি কবি মণীন্দ্র রায় এর কথা বলছি। সুধীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ..পরিচয়.. পত্রিকার পাতায় ১৯৫৪ - র গোড়ায় দিকে তিনি ..সুধীন্দ্রনাথ ও নাস্তিবাদ.. নামে এক পরিবাদি প্রবন্ধ লেখেন। মনীন্দ্র রায়ের প্রবন্ধের প্রসঙ্গে আমার চিঠির উত্তরে সুধীন্দ্রনাথ লেখেন,

..তোমার ২৬ মার্চের চিঠি যথা সময় পেয়েও এত দিন নিত্তর ছিলুম বলে কিছু মনে কোরো না। হাতে এখন নানা কাজ,

এবং পত্রের প্রসঙ্গে যেহেতু মুখ্যত আমারই রচনা, তা সে - বিষয় নিশ্চয়োক্তি আমার পক্ষে অশোভন। অবশ্য মণীন্দ্র রায় আমার সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার সঙ্গে আমি একমত নই, এবং মত - বিরোধিতার কারণ এ নয় যে তিনি আমার ছিদ্রান্বেষণে বদ্ধপরিকর, এর কারন এই যে তিনি কাব্য সম্পর্কে যথেষ্ট ভেবে দেখার অবসর এখনও পাননি, এবং নিজের পক্ষে যে -সকল নজির তিনি উদ্ধার করেছেন তার অন্য ব্যাখ্যাও হয়তো সম্ভব। তৎসত্ত্বেও এ-কথা আমি ভালো করে জানি যে আমার সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তে যত লোকের সায় আছে, ওই বিষয় অন সরকারের সিন্ধান্তে তত লোকের সমর্থন নেই, এবং সেইজন্য যে যে জায়গায় তোমার মতামত মণীন্দ্র রায়ের অনুগামী, সেখানে ভুলের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প।

পক্ষান্তরে তোমার সামাজিক আদর্শ আমার বিচারে ভয়ানক ভ্রান্ত, এবং তথাকথিত বুর্জোয়া দার্শনিকদের সম্বন্ধে তুমি যে হঠোক্তি করেছ, তাতে এই প্রমান পেলুম যে তাঁদের লেখার সঙ্গে এখন তোমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি। প্রচারকের ওজস্বিনী বক্তৃতায় কান দিয়ে এবং নিজের ভাবপ্রবণ পক্ষপাতে একদেশদর্শী না হয়ে, যদি স্বচক্ষে তথা বিজয়সহকারে গত চল্লিশ বছরের ইতিহাস পড়ে থাকলে গণতন্ত্রের শোচনীয়তা তোমার কাছে ধরা দেবে না। তুমি বুঝবে যে গণতন্ত্রের অভাবেই জার্মানির মতো আশর্চ্য জাতি দু-দুবার যুদ্ধে হেরেছে। পাশ্চাত্য সমাজে পুঁজিবাদীদেরঅপ্রতিহত একাধিপত্য যে কিংবদন্তী তার সাক্ষ্য মার্কিনের ইতিহাসেও প্রচুর, এর তথ্যমূলক বিশ্লেষণের পরে তুমিও হয়তো মানবে যে একনায়কতন্ত্রের যে - সংজ্ঞা তুমি দিতে চাও, তা ঠিক হোক বা না হোক, তাতে সাধারনের মঙ্গলমোটেই নিশ্চিত নয়। তুমি যখন সাম্যবাদী নও, অর্থাৎ ওই মত যখন তোমার ধর্ম হয়ে ওঠেনি, তখন ম্যাক্স্ ঈস্টম্যান, এড্মন্ড উইল্সন্, সিড্নি কুক্, আলবের কাম্যু, বর্ট্রেন্ড রাসেল ইত্যাদির বিদ্ধে সমালোচনা তোমার পড়েদেখা উচিত।

আশা করি ভালো আছ। এখন তুমি জলপাইগুড়িতে কেন ? কবে এ - দিকে আসছ ?

ভাবদীয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

লক্ষ করার বিষয় যে প্রত্যেকবারই লেখার তারিখ চিঠির শেষে দিতেন এবং তারপরেই সোজা নিজের নাম দস্তখতনা করে .. শুভার্থী.. বা ..বশংবদ.. বা ..ভবদীয়.. বা প্রাপকের সঙ্গে প্রেরকের সম্পর্ক - দ্যোতক কোনও শব্দ যোগ করতেন।

তার এই ৮ই এপ্রিল ১৯৫৪-র চিঠি থেকে সুধীন্দ্রনাথের ব্যাক্তিত্বের স্বরূপ পরিস্কার অনুধাবন করা যায়। তিনি বিদ্ধমতের প্রতি ধৈর্যশীল ছিলেন, নিশ্চয়োক্তিতে পরাঙ্মুখ, সাহিত্য বিশেষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে বিচারে বিশ্বাসী ছিলেন, পরোক্ষ জ্ঞানে তাঁর কোনও আস্থা ছিল না, অন্যকে নিজস্ব চিন্তায় প্রণোদিত করার ব্যাপারে ছিলেন অক্লান্ত, এবং সমস্ত বক্তব্যকে আভিজাত্যে ও আন্তরিকতায় উপস্থাপনে একান্ত সহৃদয়। এইসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যেতাঁর প্রতিটি চিঠির কাগজ-খামের নির্বাচন থেকে হাতের লেখা, অনুচ্ছেদ ভাগ, ভাষার বিন্যাস, পুরো চিঠির পারিপাট্য সব কিছু থেকে প্রকাশ পেত যে যার উদ্দেশে চিঠিটি লিখেছেন তাকে তি নি কোন মূল্য দিচ্ছেন। যে -চিঠির উত্তর দিচ্ছেন তার ভেতরকার কোনও অংশের কি মন্তব্যের উপর প্রতিক্রিয়া অথবা প্রশ্নের উত্তর জানাতে ভুলে গিয়ে থাকলে পুনশ্চতার উল্লেখ করতেন। যেমন আমি ২৬ মার্চের চিঠিতে সদ্য প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ..আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনে অমিয় চক্রবর্তীর প্রতি সম্পাদকের অতিরিক্ত পক্ষপাত সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেছিলাম। আমার তখনও মনে হত, এখনও মনে হয় যে অমিয় চক্রবর্তীর অধিকাংশ কবিতায় চোখের সামনে ভেসে ভেসে বেড়ানো দৃশ্যের কাব্যিক বর্ণনা যতটা আছে এবং বর্ণনার চোখ - ভোলানো চমৎকারিত্বে ছন্দকে দুমড়ে মুচড়ে দেওয়ার ঝোঁক যতটা আছে ততটা ছন্দ মেনে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ নেই। অবশ্যই ..শিল্প.. ..আয়শ.., ..রাত্রিযাপন.. ..কেঁদেও পাবে না তাকে.. প্রভৃতি অসাধারণ কবিতা, কিন্তু সংকলিত তাঁর আরও অনেক কবিতাই মুখ্যত দৃশ্যকাব্য, পড়ার সময় চমকিত হই, কিন্তু অস্তিত্বে মিশে যায় না। সেদিন সেই চিঠিতে কী লিখেছিলাম ঠিক ঠিক মনেনেই তবে আমার এই ধারনা খুব বেশি বদল হয়নি যে পর্যটক - কবির গুণ অর্থাৎ ছবির অ্যালবাম সাজানো এবং দোষ অর্থাৎ ছবির নীচে ছন্দ করে ক্যাপশন বসানো দুটোই তাঁর মধ্যে প্রচুর, ফলে তাঁর কবিতা

পড়ে পরোক্ষ পর্যটনের এক প্রকার অভিজ্ঞতা পাই, কিন্তু আমাকে তা অভিভূত করে না। আধুনিক বাংলা কবিতা বইখানি ও অমিয় চক্রবর্তী সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম তার উত্তরে মূল চিঠির শেষে সুধীন্দ্রনাথ পুনশ্চযোগ করলেন,

..আধুনিক বাংলা কবিতার বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত সংস্করণ পেয়েছি বটে কিন্তু এখনও পড়িনি। তাই সে- বিষয় কিছু বললুম না। অনেক বিচক্ষণ পাঠক অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় অভিনব রসের সন্ধান পেয়ে থাকেন।

সুধীন্দ্রনাথ এই চিঠিখানি আমাকে জলপাইগুড়িতে মায়ের ঠিকানায় লিখেছিলেন। আমি তখন জলপাইগুড়িতে চলে গেছলাম, কারণ ১৯৫৩ - র শেষে দিকে আমার স্বাস্থ্য খুব ভেঙে পড়ে। প্রথম কিছুদিন ছিলাম শান্তিনিকেতন হাসপাতালে । তার পর অন্নদাশঙ্কর আমাকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখেন। তাঁরা তখন সেবাপল্লীতে মকুল দে-রবাড়িতে ভাড়া থাকতেন। টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে চলে যাই জলপাইগুড়িতে মায়ের কাছে থেকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। সেখানেই তৈরি হচ্ছিলাম ফাইনাল পরীক্ষার জন্য। তখন আমার হাতে আসে মণীন্দ্র রায়ের প্রবন্ধটি। আমারচিঠির উত্তরে সুধীন্দ্রনাথ ওই চিঠিটা লেখেন। আমার সামাজিক আদর্শ নিয়ে তাঁর মন্তব্যে আমি দমে না গিয়ে আমার বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেলি, সেটার কপি পাঠিয়ে নিই ..নতুন সাহিত্য.. পত্রিকায়। কবিতাটি ..স্বীকৃতি .. নামে ..নতুন সাহিত্যের জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শিরোনামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল .. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শ্রদ্ধাস্পদেষু..। সেটি অত তাড়াতাড়ি প্রকাশের ব্যাপারে সম্ভবত তণ সান্যালের হাত ছিল, যদিও তখন পর্যন্ত তণের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি, তণের ..মাটির বেহালা ও প্রকাশিত হয়নি যাহোক আমি ..নতুন সাহিত্য..-কে অনুরোধ করি কবিতাটি প্রকাশিত হলে সেই সংখ্যার এক কপি সুধীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিতে।

এদিকে আমার ফাইনাল পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছিল। আমি শান্তিনিকেতনে এসে পরীক্ষা দিই। পরীক্ষার মাস- তারিখ মনে নেই , শুধু মনে আছে যে ভয়ংকর গরম ছিল তখন। পরীক্ষা দিয়েই আমি জলপাইগুড়িতে যাব বলে বোলপুর স্টেশনে হাজির হই। তারপর নাটকীয়ভাবে উল্টো দিকে রওনা দিয়ে একেবারে অজন্তা - ইলোরা ঘুরে গিয়ে পৌঁছোই তখনকার বোম্বাই মহানগরে। এই ভ্রমণের কথা আগে বলেছি জীবনানন্দ প্রসঙ্গে। কলকাতায় ফিরে প্রেমেন্দ্র জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখের সাথে দেখা করতে যাই। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়নি । ফিরে এসে তাঁকে দীর্ঘ চিঠি দিই বিশেষ করে গোলকোন্ডা দৌলতাবাদ ঔরঙ্গাবাদ অজন্তা ও ইলোরা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। অজন্তার কাছে ফরতাবাদ ডাকবাংলোতে একটা রাত কাটাই। বন্ধুরা তখন ঔরঙ্গাবাদের হোটলে থেকে আরও নানা দর্শনীয় বস্তু দেখেছিল। ফরতাবাদের ডাকবাংলোর চৌকিদার চার আনার বিনিময়ে আমাকে পেট ভরে মাংস পরোটা খাইয়েছিল। আমি পরদিন আবার অজন্তায় গিয়ে ভালো করে গুহাগুলি দেখি। আমার জীবনের সেরা অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে অজন্তা দর্শন একটি। আমি যা দেখেছি আমার বয়সীদের মধ্যে খুব কম লোক তা দেখেছেন। আমার এই অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলাম সুধীন্দ্রনাথকে। উত্তর পেলাম দু-তিন সপ্তাহ পরে। লিখেছেন,

..তোমার চিঠি পেয়ে ভালো লাগল বটেই, তোমার উপর হিংসাও হলো যথেষ্ট। তুমি যে - সব জায়গায় ঘুরে এলে, তার অনেক আমি আজও দেখিনি। সাক্ষাতে অজানা স্থানগুলোর বর্ণনা শুনব।

আমি যখন কোলকাতার বাইরে ছিলুম, তখন একদিন তুমি এসে ঘুরে গেছ, এ-খবর আমি যথাসময়ে পেয়েছিলুম। তোমার সঙ্গে সে - দিন দেখা হয়নি বলে এখনও খারাপ লাগছে।

অনূদিত কবিতার একখানি বই প্রেসে পাঠিয়েছি সম্প্রতি। মুখ্যত সেই জন্য এবং গৌণত আরও নানা হাঙ্গামে সম্প্রতি একবারে সময় পাইনি। তাই তোমার চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব হলো।

আশা করি কুশলে আছ। কলকাতায় এলে দেখা কোরো।
ইতি ২৪ জুলাই ১৯৫৪
ভবদীয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

..নতুন সাহিত্যে.. তোমার কবিতাটি দেখবার জন্যে উৎসুক আছি।

তাঁর হাতে ..নতুন সাহিত্য.. তখনও পৌঁছয়নি জেনে আমি কবিতাটি কপি করে তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম। সঙ্গের চিঠিতে লিখলাম জলপাইগুড়িতে বন্যা পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। হাসপাতালের গা বেয়ে গেছে করলা নদী। আমাদের বাড়ির সামনে ছিল জ্যাকসন মেডিকেল স্কুল থেকে ফার্মেসি ট্রেনিং সেন্টারে পান্তরিত প্রতিষ্ঠানের বিল্ডিং ও বিশাল খেলার মাঠ, তার দক্ষিণ প্রান্ত বেয়ে ধরধরা নদী এসে পড়েছে করলা নদীতে। সেই মিলিত স্রোত সিকি মাইল দক্ষিণে বয়ে গিয়ে পড়েছে তিস্তা নদীতে। এই জন্যে নদী তিনটেতে বর্ষার জল বাড়লেই হাসপাতাল ও আমাদের বাসার চারদিক ভেসে যেত। আর নদীতে বান এলে তো কথাই নেই, সব থইথই করত , মায়ের জন্য নৌকা আসতো, আমাদের বসার ঘরের দরজা দিয়ে গলুইটা ঢুকে পড়ত, তাতে চড়ে মা যেতেন হাসপাতালে ডিউটি করতে। হাসপাতালের মেঝে কি মায়ের কোয়াটার্সের মেঝে ছিল মাটি থেকে কাঁধ প্রমান উঁচু, সিঁড়িতে ছিল দশটা করে ধাপ। কিন্তু ১৯৫০ এর বন্যায় পলি জমে একটা ধাপ মাটির নিচে চলে যায়। তবে চুয়ান্ন সালে ঘরে জল ঢোকেনি, কিন্তু বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি ডুবে গিয়েছিল।
যাহোক, আমার চিঠি ও কবিতা পেয়ে সুধীন্দ্রনাথ লিখলেন,

..তোমার চিঠি ও কবিতা পেয়ে খুশী হলুম। আশা করি বন্যার বিপদ এতদিনে কেটে গেছে--গত তিন -চারদিনের সংবাদ ভবিয়ে তুলেছিল। তুমি ও তোমার বাড়ির সকলে খুব মুস্কিলে পড়েছিলেন নিশ্চয়ই। তোমার কবিতাটি দু-তিনবার মন দিয়ে পড়েছি। তোমার বক্তব্যে আমার সায় নেই, তা তুমি জান। কিন্তু এই বক্তব্য তোমার মধ্যে যে-আবেগ জাগায়, তার পরিচয় কবিতায় ধরা পড়েছে, এবং সেইজন্যে তর্কসত্ত্বেও এটি রসরচনা।

ছন্দ মোটের উপর ভাল লাগলো, তবে দু-এক জায়গায় উচট খেতে হয়, এবং প্রথম পর্বেই ছন্দের স্বরূপ ধরতে পারা উচিত ছিল। তা অন্তত আমি প্রথম পাঠে পারিনি, এমন কি কয়েক সেকেন্ড বুঝতে কষ্ট হয়েছিল রচনাটি গদ্যে না পদ্যে লেখা। আমার মত, ছন্দসম্বন্ধে এ-রকম সংশয় বাঞ্ছনীয় নয়, বিশেষ করে শুতে পাঠমাত্র পরিষ্কার হওয়া উচিত তুমি কি ছন্দে লিখছ।

তোমার চিঠি পাবার পরে নতুন সাহিত্যের আষাঢ় সংখ্যাও আমার হাতে এসেছে। ভালো লাগল। তোমার কবিতা কোন্ সংখ্যায় বেরবে ?
তোমার কুশল কামনা করি। ইতি ৩১ জুলাই ১৯৫৪
ভবদীয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

স্বভাবতই তাঁর এই চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু ঠিক যে কী লিখেছিলাম তা আমার মনে নেই। তবে যা লিখেছিলাম তার আভাস পাওয়া যায় সুধীন্দ্রনাথের পত্রোত্তরে। তাঁর পালটা চিঠিটা হল,

..তোমার চিঠি পেয়ে আশ্বস্ত হলুম। তোমাদের অঞ্চল সম্বন্ধে কাগজে আজ-কাল যে- সমস্ত বর্ণনা ও ছবি বেরোচ্ছে তার পরে নির্ভাবনায় থাকা অসম্ভব।

কথ্য বাংলার বিষয়ে তুমি যে লিখেছ তার সঙ্গে আমার মতবিরোধ কম। কিন্তু আধুনিক পদ্যছন্দের গতি কথ্য রীতির দিকে, এ-কথা বোধহয় ঠিক নয়।পদ্যের স্বরূপ নিয়ন্ত্রিত, সেই নিয়ন্ত্রণের ব্যতিক্রম ঘটলে পদ্য পদ্য থাকে না। গদ্যের ছন্দ বৈচিত্র্যময়, সে বৈচিত্র্য না থাকলে গদ্য একঘেয়ে হয়ে পড়ে। কিন্তু গদ্য ও পদ্যর ছন্দ স্বভাবত বিপরীত হলেও, রচন ারীতির বৈষম্য অমার্জনীয়।উভয় ক্ষেত্রেই শব্দের রূপ ও ব্যাকরণ এক হওয়াই বাঞ্ছনীয় ।অর্থাৎ গদ্যের ..সঙ্গে.. লিখব আর পদ্যে তার চেহারা হবে .সনে. --- এটা দুর্বলতার পরিচায়ক।

আশাকরি তোমাদের কুশল।ইতি ৭ আগস্ট ১৯৫৪

সেই যে পরীক্ষা দিয়ে জলপাইগুড়ি আসব বলে বোলপুর স্টেশনে পৌঁছে উলটো দিক থেকে আসা ট্রেনে জলপাইগুড়ি পুরনো বন্ধুদের দেখতে পেয়ে তাদের সঙ্গে পুরী হায়দ্রাবাদ বোম্বাইয়ের পথে বেরিয়ে পড়ি তার থেকেই আমার সশরীর শান্তিনিকেতন বাস শেষ। কিন্তু শান্তিনিকেতনের জাদু চিরদিন অশেষ। এখন যখন প্রাক্তন আশ্রমিকরা মিলিত হয়ে গাই .আমার যেথায় মরি ঘুরে সে যে যায় না কভু দূরে মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে. তখন রোম াঞ্চ লাগে।

শান্তিনিকেতনে থাকাকালে প্রায়ই কলকাতায় আসতাম। সংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ছিলেন দাদার বন্ধু, থাকতেন চিন্ত ামণি দাস লেনের একটা মেসে, তাঁর কাছেই অতিথি হয়ে উঠতাম কলকাতায় এলে তিনি বলতেন, বুকে জায়গা থাকলে ঘরেও জায়গা হয়। তাঁর কথা শুনে সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এই রকম মানুষ ধরিত্রীর লবণ। কিন্তু সুখরঞ্জনদাকে নিয়ে যেতে পারিনি সুধীন্দ্রনাথের কাছে। সাহিত্যিক আর সাংবাদিক তেল-জলের মতোই আলাদা। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ শুধুই নিছক সাহিত্যিক ছিলেন না, একজন সাংবাদিকও ছিলেন এবং ডিভিসি-তে যে চাকরি করতেন তাতেও প্রয়োজন হত উচচ াঙ্গের সাংবাদিকতার।তাছাড়া সুধীন্দ্রনাথ স্বভাবতই ছিলেন আমাদের চারপাশে বি জুড়ে যেসব ঘটে চলেছে সেসব সম্ বন্ধে অত্যন্ত ওয়াকিবহাল ও হুঁশিয়ার।

সেটা ছিল জওহরলাল নেহর সমাজতন্ত্রের যুগ। রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে জোর দহরম মহরম চলছে। কিন্তু সাম্যবাদের অ াদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাধের গভীর আশঙ্কা ছিল এবং সে আশঙ্কা প্রকাশে তিনি সর্বদা সপ্রতিভ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা যেভাবে ছবির মতো মনে থেকে গেছে পরবর্তী সাক্ষাৎগুলি সেরকম পরিস্কার নয়।তবে এটা মনে আছে যে রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে মাখামাখি নিয়ে একদিন তিনি তাঁর বিহ্বলতা প্রকাশ করলে আমি তাঁর পুনর্লিখিত কৈশোরিক কবিতা ..অসময়ে আহ্বান.. --এর উল্লেখ করেছিলাম। তার অন্তিম স্তবকে আছে, ..কান পেতে শুনি যেখানে দিগন্তরে ।পুরাতন বাধা ভাঙে বিদ্রোহ বাণে ।দেখি ঝঞ্ঝার আয়োজন অম্বরে। আমিও আহূত বুঝি মুক্তিস্নানে ।তখন সুধীন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন, ..ওটা কিছুটা বয়সের দোষ। তখন আমার বয়সতেইশ-- চবিবশ। ওই বয়সে সবারই জগৎ- সংসারের কাছে প্রচুর প্রতাশা থাকে। তা ছাড়া সেই যুগে শ বিপ্লব আমাদের সবাইকে অনেক স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করেছিল।প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্মানি ফিরে পেয়েছিল গোয়টে বেঠোফেন হাইনের উত্তরাধিকার। রিলকে, মান তখন তাঁদের ত্রিয়েটিভিটির শিখরে। জার্মানি আবার হল যেন একটা স্বপ্নের দেশ। তখন স্বপ্নভঙ্গ হল যখন আটাশ-উনত্রিশ বছর বয়সে জার্মানিতে যাই ।সালটাও ছিল উনিশশো ঊনত্রিশ। আমার মনে পড়ে গিয়েছিল ..উটপাখী.. কবিতাটির একটি পঙ্‌ক্তি, .বর্গীর ধান খায় যে ঊন্‌তিরিশে। তাঁকে সে-কথা বলাতে বলেছিলেন, ..সব দিক থেকে উনিশশো উনত্রিশ একটা অমোঘ বছর। সেই ঊনত্রিশেই মন্দার বাজার একেবারে শেষতল স্পর্শ করে। ট্রটস্কিও বহিস্কৃত হন সোভিয়েত রা শিয়া থেকে।আমি জার্মানির ডিসবাডেন- এ বেশ কিছুকাল অসুস্থতার জন্য কাটাই।তখন অনেক লেখাপড়া করেছিল াম বটে, কিন্তু নাৎসিদের দৌরাত্মত্ত নিজের চোখ দেখেছিলাম। উটপাখী কবিতাটি আমি তখনই মনে মনে লেখা শু করেছিলাম, কিন্তু কাগজে কলমে লিখতে লিখতে আরও অনেক সময় লাগে, বোধহয় বছর চার-পাঁচ। তারপর হেসে বলেছিলেন, ..চবিবশ - পঁচিশও বলতে পারো..। তাতে আমি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম, 'চবিবশ-পঁচিশ বছর বলছেন কেন ?' ব্যাখ্যা করে

তিনি বলেছিলেন, ..ছোটবেলায় যে - ছড়াটা শুনেছিলাম তাতে বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসেরস সঙ্গে ত

ানা নানা তানা ঊনতিরিশের মিল ছিল, কিন্তু এখন ঊনতিরিশের আগের কথাগুলো মনে পড়ছে না।

সমাজ - ব্যবস্থা এবং মানুষের স্বাধীনতা নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন। তিনি প্রফুল্ল প্রকৃতির হৃদয়বান মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভেতরে আর-একজন মানুষ ছিলেন উদ্বিগ্ন ও গম্ভীর। এই অন্য মানুষরি পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কবিতায় ও প্রবন্ধে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে সামাজিক ব্যবহারে তাঁর মতো আনন্দময় উষ্ণতাপূর্ণ সহৃদয় মানুষ ছিলেন উদ্বিগ্ন ও গম্ভীর। এই অন্য মানুষটির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কবিতায় ও প্রবন্ধে। মানুষের সঙ্গে সামাজিক ব্যবহারে তাঁর মতো আনন্দময় উষ্ণতাপূণূ মানুষ একান্তই দুর্লভ। সেজন্য আমার রাশিয়া - প্রীতির আধিক্য সত্ত্বেও তাঁর কাছে যখনই যেতাম তখনই মনে হত তিনি যেন আমারই প্রতীক্ষা করছিলেন। আমি তাঁকে রবীন্দ্রনাথের ..রাশিয়ার চিঠির দোহাই দিলে তিনি বলেছিলেন যে বাঙালিদের মধ্যে ..রাশিয়ার চিঠি.. রাশিয়া সম্বন্ধে উচ্ছাসের একটা বড় কারণ, কিন্তু ..রাশিয়ার চিঠিতেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বাদে রাশিয়ার সমাজ - ব্যবস্থা নিয়ে কিছু বেসিক প্রশ্ন তুলেছিলেন, সেই প্রশ্নগুলো বাঙ্গালিরা খেয়াল করে না। আর একদিন তিনি ধনতন্ত্রের বিকাশ ও স্বরূপ সম্বন্ধেআমার ধারণাকে পরিস্কার করার জন্য আমাকে টনি-র লেখা ..রিলিজিয়ন অ্যান্ডদ্য রাইজ অব ক্যাপিটালিজম.. পড়তে বলেছিলেন। তারপর টনি-র নামটা বানান করে দেন-----..টি--এ-- ডবলিউ--এন--ই ওয়াই। আমার তখন আশা ছিলযে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র গোয়টে টলস্টয় রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের প্রতিভাকে যথার্থ মূল্য দেবে, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে তা ..অসম্ভব আশা..। তাঁর মতে প্লেখানভ লুকচা কডওয়েল প্রভৃতির বক্তব্যগুলিতে রাজনীতি যতটা আছে ততটা শিল্পচি নেই। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল, অমন বড় কবিও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে সাহিত্যকে বঞ্চিত করেছেন। একই প্রকার বক্তব্য ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধেও। মানুষের মনেরগভীরে নামবার অমন প্রতিভা নিয়ে উপর থেকে দেখা ছবি এঁকে নিজেকে নষ্ট করছেন।

ইতিমধ্যে ঝিভারতী থেকে আমি পাশ করার খবর পেয়েছিলাম। আবার শান্তিনিকেতনেই পড়ব না কলকাতা ঝিবিদ্যালয়ে পড়ব ? সুধীন্দ্রনাথ অনেকদিন আগেই বলছিলেন, দু বছর শান্তিনিকেতনের অভিজ্ঞতা হয়ে গেলে
কলকাতার অভিজ্ঞতা নিয়ো। আধুনিক নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতা খুবই জরি। আমিও ভাবলাম কলকাতায় একটা স্থায়ী আস্তানা হবে আমার। প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের আরও কাছাকাছি থাকতে পারব। পার্টির উর্দি ছেড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ততদিনে আপন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। শুনে সুধীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, ..হি শুড, হি শুড। আ পোয়েট হ্যাজ নাথিং টু লুজ বাট হিজ চেন্স..।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com